পরিবেশ-নারীবাদ : একটি তুলনামূলক বিশ্লেষণ

ড. রাজিয়া খানম লাকি

পরিবেশ-নারীবাদ একটি দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গি, যা নারীর ন্যায্য অধিকার এবং পরিবেশ বিপর্যয় রোধকল্পে পরিবেশ সংরক্ষণের ওপর গুরুত্ব দেয়। নারীর ওপর পুরুষতন্ত্রের আধিপত্য ও নিপীড়নের বিভিন্ন দিক এবং প্রকৃতির ওপর মানুষের নিপীড়নের বিভিন্ন দিক তুলে ধরা পরিবেশ-নারীবাদের লক্ষ্য। ক্যারেন জে. ওয়ারেন,[১] ভাল প্লামউড,[২] মারে বুকচিন[৩] প্রমুখ পরিবেশ-নারীবাদী দার্শনিক। এ ছাড়াও রয়েছেন বন্দনা শিবা, মারে বুকচিন, জিম চেনি, মারিয়া মাইজ প্রমুখ। এ প্রবন্ধে ওয়ারেন ও প্লামউড-এর মতাদর্শ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করাসহ উভয়ের মতের সাদৃশ্য উল্লেখসহ মূল্যায়ন করা হবে।

নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের বিপরীতে ওয়ারেন ও প্লামউড যে ভিন্নধর্মী বক্তব্য প্রদান করেছেন, তার আলোচনায় দেখা যায় তাঁরা উভয়েই নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতি নিপীড়নের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। ক্যারেন জে. ওয়ারেন মূলত নারী ও পরিবেশকে অধস্তন করে রাখার বিষয়ে পুরুষতান্ত্রিক সমাজসৃষ্ট মূল্যবোধের স্বরূপ উদঘাটনে তত্ত্বমূলক মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, সমাজসৃষ্ট মূল্যবোধ প্রকৃতপক্ষে 'ধারণাগত কাঠামো' এবং 'পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো'দ্বয়ের ওপর দাঁড়িয়ে আছে।[৪] পরিবেশ নারীবাদের লক্ষ্য তাই দ্বিবিধ :

ক. সমাজসৃষ্ট ধারণাগত কাঠামো এবং এর অন্তর্ভুক্ত পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো ও কর্তৃত্বের যে যৌক্তিকতা পুরুষতন্ত্র তৈরি করেছে তার অসারতা তুলে ধরা; এবং

খ. নারী ও পরিবেশ সম্পর্কে সমাজে যে দ্বৈতবাদ প্রচলিত সেই দ্বৈতবাদের বিকল্প দর্শন প্রচলন করা।

ক্যারেন ওয়ারেন পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, পিতৃতান্ত্রিক দ্বৈততা নারী ও পরিবেশ নিপীড়নের জন্য দায়ী। পিতৃতন্ত্র নারীকে 'প্রকৃতিকরণ' এবং প্রকৃতিকে 'নারীকরণ'-এর মাধ্যমে উভয়ের ওপর নিপীড়ন চালায়। নারীর প্রকৃতিকরণ হয় যখন পিতৃতন্ত্রের প্রতিভূরা নারীকে প্রাণিজগতের নামে বর্ণনা করে; যেমন, cows, foxes, chicks, bitches, pussycats, cats ইত্যাদি। একইভাবে প্রকৃতির নারীকরণ হয় যখন প্রকৃতিকে she বলা হয়। she হলো he-এর স্ত্রীলিঙ্গ। প্রকৃতিকে এভাবে নারীরূপে স্ত্রীভাবে কল্পনা করে বলা হয়, 'she' is raped, mastered, conquered, controlled, penetrated, subdued and mined by men এবং প্রকৃতিকে 'মাতা' হিসেবে ব্যাখ্যা করা হয়।[৫] তিনি

[১] Warren, K.J. 1997, "The power and promise of Ecological Feminism" in H. LaFollete, ed., *Ethics in Practice,* Blackwell, Oxford, P. 657.
[২] Plumwood, Val., 1993, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routledge, London
[৩] Jardins, J.R.D., 1997, *Environmental Ethics. An Introduction to Environmental Philosophy*, Wadsworth, Publishing, California, PP. 243-244.
[৪] খানম, রাশিদা আখতার, ২০০৫, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, বাংলাবাজার, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৭২-৭৩।
[৫] Tong, Rosemarie Putnam, 1998, *Feminist Thought*, West View Press, USA, P. 247.

মনে করেন, পুরুষতন্ত্র যখন নিজেকে প্রকৃতির মনিব মনে করে, তখন প্রকৃতির মতো নারীকেও একই দৃষ্টিতে দেখে এবং নারী ও প্রকৃতির ওপর একইরূপ আচরণ করে। তবে পরিবেশ-নারীবাদীরা একমত যে, নারী ও প্রকৃতির মধ্যে এক গভীর সম্পর্ক রয়েছে।[৬] ওয়ারেনের মতানুযায়ী, প্রকৃতির সাথে নারীর অনিবার্য সম্পর্ক রয়েছে। তিনি সার্বিকভাবে নারীকে পুরুষের বিপরীতে দাঁড় করিয়ে প্রকৃতির সাথে যুক্ত করে দেখেন— এই যুক্তিতে যে, নারী নিপীড়নে যেমন নারী নিগৃহীত হয়, পরিবেশ শোষণেও তেমনি পরিবেশ নিগৃহীত হয়।

পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়ারেন নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের কারণ হিসেবে পিতৃতন্ত্র কর্তৃক সৃষ্ট দ্বৈত মূল্যবোধকে দায়ী করে বিস্তারিত ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে মানুষের মনে এই ধারণা জন্মেছে যে, নারী ও প্রকৃতি হলো অধস্তন, এদের ওপর কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে এবং এ কর্তৃত্ব করবে পুরুষতন্ত্র। সমাজ প্রতিষ্ঠার শুরু থেকে পুরুষতন্ত্র মানুষের মধ্যে এমন মূল্যবোধ জন্মাতে সক্ষম হয়েছে যে, প্রকৃতি ও নারী দুর্বল এবং নিম্নমানের। কাজেই এদের ওপর নিপীড়ন করা যাবে। এই মূল্যবোধের কারণে মূলত নারী ও প্রকৃতির ওপর নিপীড়ন করা হয়। পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতির ওপর যে নিপীড়ন করে সেটা তারা স্বীকার করতে চায় না; বরং তাদের কর্তৃত্ব ও আধিপত্যের মনোভাবকে বা নিপীড়নমূলক আচরণকে এভাবে তারা যৌক্তিক রূপ দেয় যে, পুরুষ শক্তিশালী, স্বাধীনচেতা, সাহসী, স্বনির্ভর, আত্মপ্রত্যয়ী। অন্যদিকে নারী হলো দুর্বল, পরনির্ভরশীল, ভীরু, আবেগময়ী, সিদ্ধান্ত নিতে অক্ষম ইত্যাদি। প্রকৃতি সম্বন্ধেও একই ধারণা পোষণ করে পুরুষতন্ত্র। তাই মানুষ পুরুষতন্ত্রের এই যুক্তিকে এতকাল লালন করে এসেছে, এর বিরুদ্ধাচারণ করে নি। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশক পর্যন্ত এই যৌক্তিকতাকে মানুষ মেনে নিয়েছে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর শেষের দিকে অর্থাৎ সত্তরের দশকে ফ্রাসোয়া দোবন পরিবেশ-নারীবাদ বিষয়টি ব্যাখ্যা করার কারণে মানুষ এ সম্পর্কে সচেতন হয়েছে এবং উপলব্ধির প্রয়াস চালিয়েছে। পরিবেশ-নারীবাদীগণ তাই পুরুষতন্ত্রের এ মূল্যবোধের অন্যায্যতা প্রতিপাদন ও অবসানের প্রচেষ্টা চালায়। ওয়ারেন এখানে নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নের জন্য সমাজের পুরুষতান্ত্রিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি (দ্বৈত মূল্যবোধ)-কে দায়ী করেছেন। অর্থাৎ তার মতানুযায়ী, সমাজের পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে যে অসম অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে তা মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যেও বিদ্যমান। দ্বৈত মূল্যবোধের কারণেই মূলত নারী ও প্রকৃতি নির্যাতিত হয় এবং সমাজে অধস্তন অবস্থায় টিকে থাকে।

পরিবেশের প্রতি মানুষের অবাধ অধিকার রয়েছে। এ ধারণার বশবর্তী হয়ে মানুষ পরিবেশকে ইচ্ছেমতো ব্যবহার করে পরিবেশ অবনয়নের সৃষ্টি করেছে, নিজ স্বার্থ পূরণের প্রয়াসে পরিবেশকে শোষণ ও নিপীড়ন করছে। নারীবাদীরা মনে করেন, পরিবেশ অবনয়ন ও পরিবেশ নিপীড়ন নারী বিষয়ক ইস্যু। কেননা পরিবেশ শোষণ করলে যেমন পরিবেশ নিপীড়িত হয়, নারী পীড়নেও তেমনি নারী নিপীড়িত হয়। এভাবে দেখা যায় যে, পরিবেশ ও নারী উভয়ে পুরুষশাসিত সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির কারণে নিপীড়িত ও বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে। নারীবাদীরা এ দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতির মধ্যে সাদৃশ্য খুঁজে পান। পরিবেশের অবনয়নকে তাঁরা তাই নারী বিষয়ক ইস্যু হিসেবে গ্রহণ করেন।[৭]

---

[৬] *Ibid*.

[৭] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৭০।

এ বিষয়টিকে ওয়ারেন তাঁর The Power and Promise of Ecological Feminism প্রবন্ধে নারী ও প্রকৃতি নিপীড়নকে 'ধারণাগত কাঠামো' বলে আখ্যায়িত করেন।[৮] ধারণাগত কাঠামো বলতে তিনি এমন কিছু মৌলিক বিশ্বাস, মূল্যবোধ, অনুমান ও দৃষ্টিভঙ্গিকে বোঝান, যা ব্যক্তিকে নিজস্ব ধারণা গঠন করতে সাহায্য করে। এ ধারণাগুলো হলো সমাজের বদ্ধমূল ধারণা, যা ব্যক্তির মনে গেঁথে যায়। ধারণাগত কাঠামো ব্যক্তির মধ্যে দৃষ্টিসহায়ক কাচের মতো কাজ করে, যা দিয়ে ব্যক্তি নিজেকে এবং তার পারিপার্শ্বিক জগৎকে উপলব্ধি করে বা মনের মধ্যে গ্রহণ করে।[৯] ওয়ারেন বলেন, এই বদ্ধমূল ধারণা পুরুষতান্ত্রিক সমাজেরই সৃষ্টি, পুরুষতন্ত্র নিজেদের উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এই ধরনের ধারণা তৈরি করেছে, যা পুরুষকে শ্রেষ্ঠ আসনে অধিষ্ঠিত করে এবং নারীকে নিকৃষ্ট মর্যাদায় স্থান দেয় বলে তিনি মনে করেন।

ওয়ারেন কতগুলো ধারণাগত কাঠামোকে আবার পীড়নমূলক হিসেবে অভিহিত করেছেন।[১০] 'পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো' বলতে তিনি সমাজে নারীর বিরুদ্ধে আমরা যেসব নির্যাতন ও নিপীড়নমূলক আচরণ করতে দেখি তাকে বুঝিয়েছেন। নির্বিচার বিশ্বাস, ধর্মীয় কুসংস্কার বা অপব্যাখ্যা সমাজ এমনভাবে তৈরি করে ও গ্রহণযোগ্য করে তুলে যে, যুগের পর যুগ মানুষ এ বিশ্বাস ও অপব্যাখ্যা মেনে নেয় এবং এগুলো ধর্মীয় বিধান বলে ধরে নেয়; যেমন সতীদাহ প্রথা এক্ষেত্রে একটি নির্মম দৃষ্টান্ত। এটি ছিল পুরুষ ধর্মবেত্তাদের দ্বারা নারীর ওপর চাপানো বিধান। ওয়ারেনের মতে, পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামো যখন পিতৃশাসিত হয় তখন তা নারীকে অধস্তন হিসেবে ব্যাখ্যা করে।[১১]

পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যের[১২] উল্লেখ করেছেন ওয়ারেন। প্রথমত, মানের ক্রমধাপ। অর্থাৎ যা কোনো কোনো অবস্থা ও শ্রেণির মধ্যে স্তরভেদ সৃষ্টি করে; যেমন, নারী-পুরুষ, মানুষ-প্রকৃতি। পুরুষ নারীকে নিম্নমানের ও নিজেদের উচ্চমানের এবং মানুষ নিজেদের উচ্চমানের ও প্রকৃতিকে নিম্নমানের মনে করে। দ্বিতীয়ত, দ্বৈত মূল্যবোধ, যা নারী ও পুরুষের মধ্যে বিভেদের সৃষ্টি করে; যেমন, পুরুষ যুক্তি-বুদ্ধির অধিকারী, নারী আবেগপ্রবণ; পুরুষ সবল, নারী দুর্বল; পুরুষ উচ্চমানের, নারী নিম্নমানের— এসব ধারণা দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে গড়ে উঠেছে। তৃতীয়ত, পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর অপর বৈশিষ্ট্য হলো আধিপত্যের যৌক্তিকতা। এটি অধিক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য কেননা এটি সমাজে এমন কতগুলো ধারণাকে মূল্যবোধ হিসেবে যৌক্তিকতা দিচ্ছে, যা সমাজে দীর্ঘস্থায়ী রূপ লাভ করেছে। পরিবেশ-নারীবাদের ক্ষেত্রেও এই কাঠামো কাজ করছে। অর্থাৎ একই দৃষ্টিভঙ্গি নারী ও পরিবেশকে অধস্তন করে রেখেছে। প্রকৃতিকে অধস্তন করার বিষয়টিকে মানুষ এভাবে যৌক্তিক রূপ দিচ্ছে যে, প্রকৃতি হলো অসচেতন; যা পারিপার্শ্বিক জগতের কোনো পরিবর্তন সাধন করতে পারে না। মানুষ যেহেতু এ কাজটি করতে পারে, অতএব প্রাকৃতিক জীব ও জড় জগতের মধ্যে মানুষ শ্রেষ্ঠ। শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে মানুষ তাই প্রকৃতিকে তার কর্তৃত্বাধীনে রাখতে পারবে। শ্রেষ্ঠত্বের যুক্তি তুলে মানুষ পরিবেশের মানবেতর প্রাণী, উদ্ভিদ, কীট-পতঙ্গ, পাহাড়-পর্বত প্রভৃতির প্রতি অধস্তনতার যৌক্তিকতা প্রদর্শন করে। পরিবেশ-নারীবাদীরা নিপীড়নের বিরোধী বলে এ ধরনের অধস্তনের যৌক্তিকতার বিরোধিতা করেন। ওয়ারেন এখানে বোঝাতে চান যে, দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে সমাজে মানুষের মধ্যে যে ধারণা (যাকে তিনি ধারণাগত কাঠামো বলে

---

[৮] Warren, K.J. 1997, *Op.Cit.*, P. 658.
[৯] *Ibid.*
[১০] *Ibid*, P. 658.
[১১] *Ibid*, P. 658.
[১২] *Ibid*, P. 658.

উল্লেখ করেছেন) গড়ে উঠেছে তা যুগ যুগ ধরে লালন করার ফলে ব্যক্তি মানুষের মনে শিকড়ের মতো গেড়ে বসেছে— যার বিপরীত মানুষ চিন্তা করতে পারে না। তাঁর মতে, একই দৃষ্টিভঙ্গি বা ধারণা (প্রকৃতি নিম্নমানের, অসচেতন) প্রকৃতির ক্ষেত্রে আরোপ করে মানুষ প্রকৃতিকে নিপীড়ন করে। অর্থাৎ ওয়ারেনের মতানুযায়ী, যে ধারণাগত কাঠামো নারী নিপীড়ন ও অধস্তনের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য সেই একই ধারণা পরিবেশ-নারীবাদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। নারী ও প্রকৃতিকে নিপীড়ন ও অধস্তন করার যে যৌক্তিকতা সমাজে প্রচলিত তার অযৌক্তিকতা তুলে ধরে নারীমুক্তি ও নারী-পুরুষ বৈষম্য দূর করা ওয়ারেনের উদ্দেশ্য।

নারীবাদের বিভিন্ন ধারা (যেমন উদারপন্থী, র‍্যাডিক্যাল, মার্কসীয়, সমাজতান্ত্রিক, অস্তিত্ববাদী) রয়েছে, এই ধারাগুলোর অভিন্ন লক্ষ্য নারীমুক্তি হলেও মতের পার্থক্য রয়েছে। ওয়ারেন দেখাতে চান যে নারীবাদের বিভিন্ন ধারণার মধ্যে পার্থক্য থাকলেও নারীবাদ মাত্রই পুরুষতন্ত্রের বিরোধী এবং পরিবেশ-নারীবাদের সঙ্গে নারীবাদের মতপার্থক্য থাকলেও পরিবেশ-নারীবাদ যেহেতু পুরুষতন্ত্রের বিরোধী, সেহেতু নারীবাদ ও পরিবেশ-নারীবাদ উভয়ের মধ্যে একটি বিষয়ে সাদৃশ্য আছে। আর এ সাদৃশ্য হলো পীড়নমূলক ধারণাগত কাঠামোর অন্তর্গত অধস্তনের ওপর কর্তৃত্ব করার যে যৌক্তিকতা সমাজে প্রচলিত, তার অসারতা ব্যাখ্যা করা।[১৩]

পরিবেশ-নারীবাদ অনুসারে, নারী ও পরিবেশ উভয়ে পুরুষতান্ত্রিক নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির কারণে সমাজে অধস্তন শ্রেণিরূপে বিবেচিত ও বৈষম্যের শিকার। ওয়ারেনের মতে, নারী বৈষম্য ও প্রকৃতি বৈষম্যের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে এবং এই সাদৃশ্যের জন্য পরিবেশ-নারীবাদ নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে পড়ে।[১৪] সমাজের প্রচলিত ধারণা বলে যে, নারী দুর্বল ও হীন, অপরদিকে পুরুষ সবল ও পরাক্রমশালী; তাই নারীর ওপর পুরুষের আধিপত্য বিস্তার করার এ দাবিটি যৌক্তিক। নারী সম্বন্ধে এমন ধারণাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা হয়, প্রকৃতি দুর্বল তাই প্রকৃতির ওপর মানুষের যথেচ্ছাচারের অধিকার আছে। অর্থাৎ ওয়ারেন বোঝাতে চান যে, নারী ও প্রকৃতিকে একই বৈশিষ্ট্যের কারণে নিপীড়ন করা হচ্ছে। পরিবেশ-নারীবাদ নারী ও প্রকৃতি সম্বন্ধে সমাজের এমন ধারণার প্রতিবাদ করে।

পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে ওয়ারেনের ব্যাপক আলোচনাকে দুই পর্বে[১৫] ভাগ করা যায়। প্রথম পর্বে পরিবেশ-নারীবাদকে নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত করে তার তাত্ত্বিক এবং যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ। দ্বিতীয় পর্বে ওয়ারেনের নিজস্ব দর্শন পরিবেশ-নারীবাদ সংক্রান্ত ব্যক্তিক নীতিদার্শনিক আলোচনা। ওয়ারেনের ব্যক্তিক নীতিদর্শন গবেষণার প্রাসঙ্গিকতায় আলোচনা করা হলো।

ওয়ারেনের মতে, পরিবেশ-নারীবাদ নারীবাদ থেকে ভিন্ন কিছু নয় বরং তাত্ত্বিকভাবে নারীবাদের অন্তর্ভুক্ত। সমাজের প্রচলিত ধারণা হলো নারী দুর্বল, কোমল, আবেগপ্রবণ, সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ, তাই পুরুষ নারীর ওপর কর্তৃত্ব ও আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। নারী সম্পর্কে এমন ধারণাকে প্রকৃতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ করে বলা যায়, প্রকৃতি দুর্বল, তাই প্রকৃতির ওপর মানুষের ইচ্ছেমতো কর্তৃত্ব করার অধিকার আছে। নারী ও প্রকৃতিকে সমাজ একই বৈশিষ্ট্য দিয়ে বিচার করে। সমাজে এ ধরনের ধারণাও প্রচলিত যে, নারী ও প্রকৃতি উভয়েই নিম্নমানের ও হীন মর্যাদার। পরিবেশ-নারীবাদ নারী ও প্রকৃতির প্রতি সমাজসৃষ্ট এমন ধারণার প্রতি

---

[১৩] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৭২।
[১৪] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৭৩।
[১৫] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৭৩।

বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করে। নারীবাদীরা নারী বিষয়ক বিভিন্ন ইস্যুকে (ভোটের অধিকার, সমঅধিকার) কেন্দ্র করে 'নারীবাদ' ধারণার সূত্রপাত করেছিল বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের শেষ দিকে। বর্তমানে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এবং তৃতীয় বিশ্বের দেশগুলোতে নারীবাদ সম্পর্কিত চিন্তা ও আন্দোলন ব্যাপকভাবে শুরু হয়েছে। কিছু কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে Women Studies বা নারী অধ্যয়ন বিভাগও খোলা হয়েছে। তাই নারীর অধিকার, যোগ্যতা, মূল্যবোধ, নারী নিপীড়নের কারণ প্রভৃতি সম্পর্কে মানুষ এখন কিছুটা হলেও জানার সুযোগ পাচ্ছে। কিন্তু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে 'নারী' সম্পর্কে কোনো আলোচনা নেই। প্রতিষ্ঠানে নারী সম্পর্কে অধ্যয়ন করতে হলে নারী অধ্যয়নকে একটি ডিসিপ্লিনে রূপ দিতে হবে এবং তার নিজস্ব একটি পদ্ধতি থাকতে হবে। ওয়ারেন তাঁর The Power and Promise of Ecological Feminism প্রবন্ধে এই পদ্ধতির কথা উল্লেখ করেন।[১৬]

তাঁর উত্তম পুরুষ ন্যারেটিভ[১৭] একটি পদ্ধতি। পদ্ধতি হিসেবে যখন একটি মতকে বিচার করা হয় তখন তা যৌক্তিক রূপ পায়। কিন্তু একটি মত তখনই গ্রহণযোগ্য হবে যখন তা সার্বিক হয়। নারী বিষয়ক ইস্যুগুলো সার্বিক নয় বলে পুরুষতন্ত্র অগ্রাহ্য করে। নারী যখন কোনো কিছু সত্য বলে দাবি করে, তখন তার প্রেক্ষিত থেকে দাবি করে। তাঁর মতানুযায়ী, নারীর প্রত্যক্ষণ, নারীর মূল্যবোধ, নারীর অনুভূতি কখনো পুরুষের পক্ষে উপলব্ধি করা সম্ভব নয়। নারীর প্রত্যক্ষণে care attitude কাজ করে বলে নারীর প্রত্যক্ষণ পুরুষ থেকে ভিন্ন। নারীবাদীরা ব্যক্তিককে (subjective) স্থান দিয়েছেন, আর যা কিছু ব্যক্তিক তাই আপেক্ষিক। ওয়ারেন নারীর সমস্যাকে নারী যে সমাজে বাস করে সে সমাজের প্রেক্ষিতে বিবেচনা করার ওপর গুরুত্ব দেন। এভাবে তিনি প্রেক্ষিতনির্ভর তাত্ত্বিক আলোচনা করেন।

ওয়ারেন উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভের মাধ্যমে নারী প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেছেন। তাঁর উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ একটি deductive method বা অবরোহ পদ্ধতি। তাঁর মতে, নারী প্রেক্ষিত হলো বিশেষ। এই বিশেষ প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা বিশেষ প্রেক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ইঙ্গিত করে। আর উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। তিনি মনে করেন, সনাতনী নীতিবিদ্যা নৈর্ব্যক্তিক (objective) নিয়ম-নীতির ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে কিন্তু উত্তম-পুরুষ বিবরণকে এক্ষেত্রে অবহেলা করা হয়। উত্তম-পুরুষ বিবরণ প্রকৃতার্থে ব্যক্তিবিশেষের অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়। তাই তিনি ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিভঙ্গি থেকে নারী ও প্রকৃতিকে ব্যাখ্যা করেছেন।[১৮]

নারীবাদ এবং পরিবেশ নীতিবিদ্যায় চারটি কারণে উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ গুরুত্বপূর্ণ এবং নৈতিক সিদ্ধান্তগ্রহণ ও তত্ত্ব নির্মাণের ক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে বলে ওয়ারেন মনে করেন। তিনি উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভের পক্ষে চারটি[১৯] কারণের কথা ব্যক্ত করেছেন। প্রথমত, উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ আমি-সে, আমরা-তারা, ব্যক্তিসত্তা-অপরসত্তা ইত্যাদি সম্পর্কের ভিত্তিকে বিশেষভাবে নির্মাণ করে। এমন ন্যারেটিভ ব্যক্তিক অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করে। যার ফলে বৈষম্যমূলক সম্পর্ক যেমন মানব-অমানব-প্রকৃতি, জীব-জড় ইত্যাদির অস্তিত্ব ও পারস্পরিক সম্পর্ক গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। দ্বিতীয়ত, উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ নৈতিকতার ক্ষেত্রে আচরণের সার্বিকীকরণ অপেক্ষা বৈচিত্র্যের যৌক্তিকতায় বিশ্বাস করে। তৃতীয়ত, উত্তম-

---

[১৬] Warren, K.J., *Op.Cit*. P. 662.
[১৭] *Ibid*, P. 662.
[১৮] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৭৩।
[১৯] Warren, K. J., *Op. Cit.*, P. 663.

পুরুষ ন্যারেটিভের মধ্যে সৌহার্দ্যপূর্ণ উদার মনোভাব প্রকাশ পায়, যা কর্তৃত্বপূর্ণ ও আধিপত্য বিস্তারকারী দৃষ্টিভঙ্গির বিপরীত। তাঁর মতানুযায়ী, নারীবাদী নীতিবিদ্যা ও পরিবেশ নীতিবিদ্যার জন্য প্রেম-প্রীতিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি প্রয়োজন। বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে ব্যক্তির মধ্যে বিশ্বাস, মূল্যবোধ ও মনোভাব গড়ে ওঠে, তাই নৈতিক বাধ্যবাধকতার বিষয় আরোপের চেয়ে এগুলোর উন্মেষের দিকটিকে তিনি গুরুত্ব দেন। চতুর্থত, ওয়ারেন ন্যারেটিভ সম্পর্কে বলেন, উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ সিদ্ধান্তমূলক হয়ে থাকে। ন্যারেটিভে বিশেষ প্রেক্ষিতের বর্ণনা থাকে এবং এই বর্ণনার মধ্যে নৈতিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত থাকে। একই সাথে ন্যারেটিভ এমন সমাধানের ইঙ্গিত দেয়, যা নৈতিক অবস্থার সাথে মানানসই সিদ্ধান্ত (appropriate conclusion) হতে পারে। ওয়ারেন উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভের মাধ্যমে নারী প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, নারীর বিষয়গুলো (যেমন নারীর চিন্তা-চেতনা, অনুভূতি, পরিচর্যানীতি, মূল্যবোধ) বিশেষ। এই বিশেষ প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিতে হবে। কেননা বিশেষ প্রেক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে ইঙ্গিত করে। আর উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ বাস্তব অভিজ্ঞতাকে তুলে ধরে। তাই তিনি পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে উত্তম পুরুষ ন্যারেটিভের কথা উল্লেখ করেছেন— যা নারী ও প্রকৃতিকে নিপীড়ন এবং অধস্তন অবস্থা থেকে মুক্ত করতে সহায়তা করতে পারে।

ওয়ারেনের উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি-অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দেয়। তিনি প্রকৃতি ও নারীকে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতার দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করেছেন। বিশেষ প্রেক্ষিতের গুরুত্ব এখানে অপরিসীম, কেননা বিশেষ প্রেক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। বিশেষ প্রেক্ষিত বাস্তব অভিজ্ঞতার সাথে সম্পর্কযুক্ত। আর বাস্তব অভিজ্ঞতা থেকে মানুষের মধ্যে নৈতিক চেতনা গড়ে ওঠে। পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যার ক্ষেত্রে প্রেম-প্রীতিপূর্ণ কেয়ার মনোভাব আবশ্যক, যা নারীর মধ্যে রয়েছে। এক্ষেত্রে আমরা নারীবাদী ক্যারল গিলিগানের মতাদর্শ ব্যাখ্যা করতে পারি। তাঁর মতে, নারীর মধ্যে পরিচর্যানীতি (care principle) রয়েছে। তিনি প্রমাণ করতে চান যে নারী অভিজ্ঞতা নারীকে একটি দ্বন্দ্বে ফেলে দেয়। একদিকে স্ব-সত্তা অন্যদিকে অপরসত্তার প্রতি সমবেদনা, পরিচর্যানীতি অর্থাৎ স্ব-সত্তার বাইরে অন্য কোনো সত্তাকে আঘাত না করার বোধ নারীর নৈতিক চেতনাকে ভিন্ন রূপ দেয়।[২০]

ওয়ারেনের ন্যায় গিলিগান (Gilligan), নেল নুডিংস (Nel Noodings), সারা রুডিক (Sara Ruddick) প্রমুখ বিশেষ প্রেক্ষিতের কথা বলেছেন। এঁদের মতে, পরিচর্যানীতি বিশেষভাবে একজন নারীর প্রেক্ষিত। তাই নারীর প্রেক্ষিত থেকে নারী চেতনাকে বিশ্লেষণ করতে হবে।[২১] নারী প্রেক্ষিত থেকে নারীর নৈতিক চেতনাকে বিশ্লেষণ করার বিষয়টি গিলিগান সর্বপ্রথম তুলে ধরেন। তিনি মনে করেন, নৈতিক চেতনা বলতে আমরা বুঝি আত্মোপলব্ধি, আত্মমর্যাদাবোধ, যা নারীর মধ্যে বিরাজমান এবং তা থেকে বলা যুক্তিসম্মত যে নারী নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে সক্ষম। স্ব-সত্তার চেতনা দিয়ে নারী নৈতিক চেতনাকে নির্ধারণ করে।[২২] তিনি বোঝাতে চান, পরিচর্যানীতি মানুষের মধ্যে পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে তুলে, পার্সোনাল ও পাবলিক যেকোনো শ্রেণি বিভাজন মোচন করতে সাহায্য করে এবং কোনো সত্তাকে আঘাত না করার চেতনা বা বোধ শাসক ও অধস্তনের পার্থক্যকে দূর করে উভয়ের মধ্যে প্রীতির সম্পর্ক গড়ে তুলতে সাহায্য করে; যা নারীর মধ্যে রয়েছে। নারী এই চেতনার কারণে প্রকৃতিকে আঘাত না করে বরং রক্ষা করে। গিলিগানের মতে,

---

[২০] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৪১।

[২১] Jardins, J.R.D., *Op.Cit.*, P. 251.

[২২] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৪১।

পরিচর্যানীতি কেবল নারী প্রেক্ষিত, তাই নারী প্রকৃতির প্রতি যত্নশীল। ওয়ারেন ও গিলিগান উভয়েই নারী প্রেক্ষিতের কথা বলেছেন। ওয়ারেন উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভের মাধ্যমে নারী প্রেক্ষিতকে তুলে ধরেছেন। অপরদিকে গিলিগান পরিচর্যানীতি নারীর প্রেক্ষিত বলে অভিমত দিয়েছেন। এদিক থেকে উভয়ের মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে।

ওয়ারেন উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভে যে বিশেষ প্রেক্ষিতের কথা বলেছেন, সেখানে নৈতিক সমস্যা সমাধানের ইঙ্গিত রয়েছে। ন্যারেটিভে ব্যক্তিক অভিজ্ঞতা ও মূল্যবোধ পরিবেশ সম্বন্ধে যেমন মমত্বপূর্ণ মনোভাব ব্যক্ত করে, তেমনি অন্যের প্রতি সম্মানপূর্ণ ও সহানুভূতিশীল মনোভাব ব্যক্ত করে। এমন মনোভাব নৈতিকতার শামিল এবং আধিপত্যের মনোভাব থেকে ভিন্ন। সমাজে কতগুলো নৈতিক নিয়ম (ভালো, সঠিক, উচিত) আছে, সেগুলো মূল্য বিষয়ক। এগুলোর ভিত্তিতে নৈতিকতা গড়ে ওঠে। নৈতিক আচরণের নিয়মগুলো সার্বিক। অর্থাৎ মূল্য বিষয়ক কোনো কিছু হতে হলে সার্বিক হতে হবে। আবার কতগুলো নিয়ম আছে, যা সংস্কৃতি ও ব্যক্তিভেদে ভিন্ন হয়। সময়ের পরিবর্তনে এগুলো পরিবর্তিত হয়; যেমন, ‘নারী নির্যাতন’কে যখন আমরা বর্ণনা করি, তখন যার ক্ষেত্রে এটা ঘটেছে তার দিক/অভিজ্ঞতা থেকে বর্ণনা করি। এখানে ব্যক্তির যে দৃষ্টিভঙ্গি তা অন্য ব্যক্তির ক্ষেত্রে ভিন্নরকম হবে। বর্ণনার মধ্যে ভিন্ন ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি পরিলক্ষিত হয়। ওয়ারেনের মতে, সার্বিক নিয়ম দিয়ে যদি আমরা একটি বিষয়বস্তুকে (নারী প্রেক্ষিত) জানতে চাই, তাহলে তা সবার ক্ষেত্রে (নারী ও পুরুষ) অভিন্ন হবে না। কেননা নারী ও পুরুষের প্রেক্ষিত ভিন্ন। নারী জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা (গর্ভধারণ, গর্ভপাত ইত্যাদি) আছে, যা পুরুষ কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। এ অভিজ্ঞতাগুলো নারীর জীবনেই ঘটে। নারী যখন কোনো ঘটনাকে বর্ণনা করে তখন অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে একাত্মতা অনুভব করে। এখানে loving বা affection-এর একটি বোধ কাজ করে, যা পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে না। পুরুষের মধ্যেও loving বোধ আছে, কিন্তু তা নারীর মতো নয়। জন্মসূত্রে নারীর মধ্যে এ গুণটি প্রবল। সেজন্যই দেখা যায়, নারী তার সন্তানের স্বার্থে নিজ জীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা ও শৈশবের লালিত স্বপ্ন জলাঞ্জলি দিতে যেমন দ্বিধাবোধ করে না, তেমনি পরিবেশের প্রতিও নারীর এই affection কাজ করে। যে কারণে নারী পুরুষের তুলনায় পরিবেশকে কম শোষণ করে।

ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টি দিয়ে মানুষ যখন কোনো কিছু প্রত্যক্ষ করে, তখন তা মানুষের নিকট যেমন মূল্যবানরূপে ধরা পড়ে, তেমনি তার সাথে মানুষ একাত্ম হতে পারে। ওয়ারেন এখানে ভালোবাসাপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি বা মমত্বপূর্ণ মনোভাবের ইঙ্গিত দিয়েছেন। এক্ষেত্রে আমরা ওয়ারেনের মতাদর্শের (মমত্বপূর্ণ মনোভাব) সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নারীবাদী দার্শনিক মেরিলিন ফ্রাই (Marilyn Frye)-এর বক্তব্য উল্লেখ করতে পারি। তাঁর মতে, প্রত্যক্ষণ দুই প্রকার; যেমন, ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রত্যক্ষণ (Arrogant Perception) ও ভালোবাসাপূর্ণ প্রত্যক্ষণ (Loving Perception); এবং এ প্রত্যক্ষণ পরস্পর পৃথক। যে চোখে ভালোবাসার দৃষ্টি রয়েছে, তা অবশ্যই প্রকৃতিকে সহানুভূতির দৃষ্টিতে দেখবে। ভালোবাসাপূর্ণ প্রত্যক্ষণ মূলত কোনো বস্তুকে সামান্যীকরণ বা সংকোচন করার পক্ষপাতী নয় বরং বিশেষ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করে। কিন্তু ঔদ্ধত্যপূর্ণ প্রত্যক্ষণ কোনো কিছুকে আধিপত্য বিস্তারকারী হিসেবে বিবেচনা করে সংকীর্ণ দৃষ্টিতে দেখে। অর্থাৎ মমত্বপূর্ণ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গি এখানে অনুপস্থিত।[২৩]

দার্শনিক কান্ট ও রলস উভয়ে সার্বিকতার ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। কিন্তু যেকোনো নিয়মকে সার্বিক করতে গেলে স্থানিক, কালিক অবস্থা ও ব্যক্তিবিশেষের সাথে সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোকে উপেক্ষা করা হয়। মানবসমাজ

---

[২৩] Warren, K.J., *Op.Cit.*, P. 664.

ও পরিবেশের অনেক বিষয়কে অগ্রাহ্য করে সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা হয়। উদাহরণস্বরূপ, ভাষা, সংস্কৃতি, ধর্ম ইত্যাদি ভেদে ব্যক্তি মানুষের অবস্থান ভিন্নরকম হয়। এসব ভিন্নতার মধ্যে সার্বিক নিয়ম প্রতিষ্ঠা করা বিমূর্ত ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়। সার্বিক নিয়ম প্রণয়ের ক্ষেত্রে পরিচর্যা, মমতা, বিশ্বাস ইত্যাদি মনোভাবকে বিশেষ ক্ষেত্র বা শর্তনির্ভর বিবেচনা করে বর্জন করা হয়। ফলে সার্বিক নিয়মের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না এমন অনেক কিছু ন্যায়বিচার থেকে বঞ্চিত হয়; যেমন, নারীর আবেগ, অনুভূতি, পরিচর্যানীতি ইত্যাদি। ওয়ারেনের মতে, এগুলো সার্বিক নয় বিশেষ ও ব্যক্তিক নীতি। তিনি বলেন, সার্বিক নয় বলেই পুরুষতন্ত্র এগুলোকে অগ্রাহ্য করেছে। পুরুষতন্ত্রের যে সর্বজনীন ধারণা সেক্ষেত্রে ব্যক্তিককে গুরুত্ব না দিয়ে নৈর্ব্যক্তিককে গুরুত্ব দেয়া হয়। ফলে নারী তার ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়। ওয়ারেনের উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ হচ্ছে ব্যক্তিক নীতি। ব্যক্তিক নীতি সর্বজনীন নয়, আপেক্ষিক। আপেক্ষিকতা সবসময় ঘটনার সাথে যুক্ত। নারীর প্রেক্ষিত কোনো না কোনো ঘটনার সাথে যুক্ত, তাই ব্যক্তিককে বিশেষ হলেও গুরুত্ব দিতে হবে। নারীবাদীরা ব্যক্তিককে স্থান দিয়েছেন বলে এখানে আবেগ স্থান পেয়েছে।

ওয়ারেন পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে যে উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভের উল্লেখ করেছেন, তা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ অনুযায়ী, নারী ও পুরুষের মধ্যে বায়োলজিক্যাল পার্থক্য আছে; কিন্তু এই পার্থক্যকে ভিত্তি করে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারীকে নিপীড়ন ও অধস্তন করে রাখে এবং দ্বৈত মূল্যবোধের সৃষ্টি করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, নারী ও পুরুষের মধ্যে যে প্রকৃতিগত পার্থক্য আছে সে পার্থক্যকে স্বীকার করতে হবে, মর্যাদা দিতে হবে। অর্থাৎ নারী প্রেক্ষিত, নারী অভিজ্ঞতা ও নারী মূল্যবোধকে গুরুত্ব দিতে হবে। ক্যারল গিলিগানও ওয়ারেনের মতো নারীবাদী নীতিবিদ্যা সম্বন্ধে সার্বিক নীতির পরিবর্তে ব্যক্তিক নীতির গুরুত্ব ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, নারী অভিজ্ঞতা নারী প্রেক্ষিতের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। নারী তার স্থানিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতে মূল্যবোধ নির্মাণ করে, সেজন্য নারীর মূল্যবোধ অনন্য। এ দৃষ্টিকোণ থেকে গিলিগানের নারীবাদী নীতিবিদ্যা পরিচর্যানীতিবিদ্যা নামে পরিচিত। উপর্যুক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে বলা যায়, ওয়ারেনের পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যায় উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ পদ্ধতিটি র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ ও ক্যারল গিলিগানের পরিচর্যানীতিবিদ্যার সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। ওয়ারেন যেমন তাঁর উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভে বিশেষ প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দিয়েছেন, তেমনি র‍্যাডিক্যাল নারীবাদী ক্যারল গিলিগানও বিশেষ প্রেক্ষিত অর্থাৎ নারী প্রেক্ষিত ও নারী অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। গিলিগানের মতে, নারীর মধ্যে পরিচর্যানীতি রয়েছে, যে নীতির কারণে নারী নিজসত্তার বাইরে অপরসত্তার প্রতি মমত্বপূর্ণ আচরণ করে। পরিবেশ-নারীবাদী ওয়ারেনও তাঁর মতাদর্শে প্রেম-প্রীতিপূর্ণ কেয়ার মনোভাবের কথা বলেছেন। অর্থাৎ নারীবাদী নৈতিকতার মধ্যে যেমন পরিচর্যা বা কেয়ার মনোভাবের ভিত্তি স্বীকার করা হয়েছে, পরিবেশ-নারীবাদের ক্ষেত্রেও তেমনি পরিচর্যা বা কেয়ার দৃষ্টিভঙ্গির ভিত্তিকে গ্রহণ করা হয়েছে। গিলিগান ও ওয়ারেন উভয়ে সার্বিক নীতির পরিবর্তে ব্যক্তিক নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন। ফলে পুরুষের নিকট যেমন নারীর বিশেষ গুণাবলি ধরা পড়বে, তেমনি মানুষের মধ্যে অপরসত্তা অর্থাৎ অমানব প্রাণী, উদ্ভিদ, পাহাড়-পর্বত ইত্যাদির প্রতি মমত্ববোধ বৃদ্ধি পাবে এবং মানুষ প্রকৃতিকে কম শোষণ করবে। কেননা সার্বিক নীতিতে মমত্ববোধ, পরিচর্যার মনোভাব ইত্যাদি বিষয়কে গুরুত্ব দেয়া হয় না, যা ব্যক্তিক নীতিতে গুরুত্ব পায়।

পরিবেশ-নারীবাদ প্রসঙ্গে ওয়ারেনের উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ একটি নতুন দৃষ্টিভঙ্গি হলেও সমালোচনার উর্ধ্বে নয়। তাঁর উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ হলো বিশেষ প্রেক্ষিত। ওয়ারেনের মতানুযায়ী, বিশেষ প্রেক্ষিত সর্বজনীন নয়, আপেক্ষিক। এই বিশেষ প্রেক্ষিতকে সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা সময়সাপেক্ষ ব্যাপার।

যুগ যুগ ধরে পুরুষতন্ত্র সমাজে এ ধারণা ব্যক্ত করে আসছে যে, কোনো কিছু (মতবাদ) গ্রহণযোগ্য করতে হলে সর্বজনীন হতে হবে। এই ধারণা থেকে বিশেষ প্রেক্ষিতকে গুরুত্ব দেয়া বা সমাজে গ্রহণযোগ্য করে তোলা কষ্টসাধ্য ব্যাপার।

পরিবেশ-নারীবাদ ও নারীবাদ উভয় মতবাদের লক্ষ্য হচ্ছে নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের যে দ্বৈত মূল্যবোধ তা সমাজ থেকে অপসারণ করা। ধারণাগত কাঠামো একদিকে যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য তৈরি করছে, অপরদিকে তেমনি প্রকৃতি ও মানুষের মধ্যে বৈষম্যের প্রাচীর গড়ে তুলছে। ওয়ারেনের মতানুযায়ী, এই ধারণাগত কাঠামোর জন্য নারী ও প্রকৃতি নিগৃহীত হয়ে আসছে। পরিবেশ-নারীবাদের লক্ষ্য হচ্ছে উপর্যুক্ত বৈষম্যকে ব্যাখ্যা করা এবং নৈতিক দৃষ্টিকোণ থেকে নারী ও প্রকৃতিকে মর্যাদাপূর্ণ আসনে অধিষ্ঠিত করা। এ প্রসঙ্গে ওয়ারেনের পরিবেশ-নারীবাদ গুরুত্ব লাভ করেছে।

পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে ওয়ারেন যে বিকল্প দার্শনিক ব্যাখ্যা দিয়েছেন, তা যথেষ্ট গুরুত্বের দাবিদার। নারীর জীবনে কিছু অভিজ্ঞতা ঘটে (যেমন সন্তানধারণ, সন্তান জন্মদান, গর্ভপাত ইত্যাদি), যা জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যের কারণে পুরুষের ক্ষেত্রে ঘটে না এবং ঘটা সম্ভবও নয়। ফলে পুরুষতন্ত্র কখনোই নারীর এই ভিন্ন অভিজ্ঞতা উপলব্ধি করতে পারে না বলে নারীকে সার্বিকভাবে মূল্যায়ন করা তাদের পক্ষে সম্ভব হয় না। নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি বাস্তব ঘটনা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে এবং তা সবার ক্ষেত্রে একরকম হলেই সমাজে গ্রহণ করা হয়, তা না হলে বাতিল হয়। পাকিস্তানের মুখতার মাই-এর ওপর সংঘটিত লোমহর্ষক গণধর্ষণের ঘটনা[২৪], বাংলাদেশের সিলেট জেলার নূরজাহানকে মাটিতে পুঁতে পাথর ছোড়ার ঘটনা[২৫]— এগুলো ব্যক্তিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করতে হবে। কেননা এরকম ঘটনা ব্যক্তিক, যা কেবল নারীর ক্ষেত্রেই ঘটে থাকে।

ওয়ারেন পরিবেশ-নারীবাদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে নারী অভিজ্ঞতার যে বিকল্প ব্যাখ্যা দিয়েছেন তা পুরুষতান্ত্রিক বিবেচনা অপেক্ষা অনেক বেশি সহায়ক হবে বলে মনে করা হয়। নারীর ঘটনা কখনোই নারীর দৃষ্টিতে বিচার করা হয় না, যদি তাই হতো তাহলে সমাজে এরকম ঘটনার আর পুনারাবৃত্তি হতো না।

ভাল প্লামউড একজন নারীবাদী দার্শনিক। তিনি জেন্ডার বৈষম্য সম্পর্কে যেমন সচেতন, তেমনি পরিবেশ নৈতিকতা সম্বন্ধেও সচেতন। জেন্ডার বৈষম্যকে তিনি প্রকৃতি নিপীড়নের সাথে এক করে দেখেছেন বলে পরিবেশ-নারীবাদী হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছেন। তাঁর মতে, পরিবেশ-নারীবাদ প্রকৃতপক্ষে নারীবাদের ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং নারীবাদের সাথে সম্পর্কিত। তাই তিনি পরিবেশ-নারীবাদকে সবিচার পরিবেশ-নারীবাদ হিসেবে আখ্যায়িত করেন।[২৬] তাঁর সবিচার পরিবেশ-নারীবাদ আলোচনার দুটি গুরুত্বপূর্ণ দিক রয়েছে। প্রথমটি দ্বৈতবাদের দিক এবং দ্বিতীয়টি লিবারেল-নারীবাদ ও র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের মূল্যায়নমূলক আলোচনা।[২৭] এই দুটি দিক আলোচনার মাধ্যমে প্লামউডের সবিচার পরিবেশ-নারীবাদ আমাদের কাছে স্পষ্ট হবে।

---

[২৪] মিঞা, মোঃ আকবর আলী, ২০০৬, ১৮ই মে, *দৈনিক ইত্তেফাক*।

[২৫] বেগম, সুরাইয়া, ১৯৯৭, "বাংলাদেশ মৌলবাদ এবং নারী : একটি পর্যালোচনা" মেঘনা গুহঠাকুরতা ও অন্যান্য সম্পাদিত, *নারী প্রতিনিধিত্ব ও রাজনীতি*, সমাজ নিরীক্ষণ কেন্দ্র, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৪৯।

[২৬] Plumwood, Val, 1997, *Feminism and the Mastery of Nature*, Routeledge. P.1.

[২৭] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৮৫।

মানব সভ্যতার প্রাচীন যুগের অ্যারিস্টটল[২৮] ও প্লেটোর[২৯] দর্শন থেকে শুরু করে আধুনিক সময় পর্যন্ত দেকার্ত[৩০] ও কান্টের[৩১] দর্শনে আমরা দ্বৈততা লক্ষ করি। পাশ্চাত্য সমাজে আমরা ক্ষমতার যে বৈষম্য দেখতে পাই, সেখানেও দ্বৈতবাদী কাঠামো রয়েছে; যেমন, সংস্কৃতি/প্রকৃতি, পুরুষ/নারী, মানব/দাস, পাবলিক/প্রাইভেট, সার্বিক/বিশেষ, নিজ/অপর, বুদ্ধি/আবেগ, সার্বিক/বিশেষ ইত্যাদি মানব/প্রকৃতি।[৩২]

দ্বৈতবাদী এই বিপরীত শব্দের ভেতর দিয়ে নারী-পুরুষ ভেদাভেদ ও মানব-প্রকৃতি বৈষম্যের সৃষ্টি হয়েছে। এই দ্বৈততার কারণে সংস্কৃতিতে অপমূল্যবোধের সৃষ্টি হয়েছে, যার মূলে রয়েছে পিতৃতন্ত্রের কৌশলী চিন্তাধারা। সনাতনী ও আধুনিক দার্শনিকরা নারী ও প্রকৃতিকে হীন ও নিম্নমানের মনে করেন পিতৃতন্ত্র কর্তৃক তৈরি দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে। কিন্তু পরিবেশবিদরা পরিবেশ আন্দোলনের মাধ্যমে মানুষের এ দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন ঘটিয়েছেন। সাম্প্রতিককালে পরিবেশ নীতিবিদ্যায় পরিবেশের প্রতি মানুষের নৈতিক দায়িত্বকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। পরিবেশের ভালো-মন্দ বিচার করা এখন নীতিবিদ্যক বিষয়ে পরিণত হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ এ যাবৎ পরিবেশের স্বতঃমূল্যের দিককে উপেক্ষা করে পরিবেশকে সহায়ক মূল্যে গ্রহণ করেছে। কিন্তু পরিবেশ নীতিবিদ্যা বর্তমানে মানুষের মতো পরিবেশের স্বতঃমূল্যর দিকটি দার্শনিক আলোচনায় তুলে ধরেছে। ফলে পরিবেশকে ইতিবাচক দৃষ্টিতে (পরিবেশের স্বতঃমূল্য রয়েছে) মূল্যায়ন করা শুরু করেছে। পরিবেশ নীতিবিদরা পরিবেশের প্রতি মানুষের নির্বিচারী ব্যবহার রোধ করার জন্য পরিবেশ নীতিবিদ্যার তাত্ত্বিক আলোচনার গুরুত্ব রয়েছে বলে মনে করেন। প্লামউডের মতানুযায়ী, পরিবেশকে যেজন্য তুচ্ছ জ্ঞান করে উপেক্ষা করা হয়, নারীকেও একই কারণে উপেক্ষা করা হয়। নারীবাদ পাশ্চাত্য দ্বৈতবাদী কাঠামোকে এজন্য দায়ী করে থাকে।[৩৩] অর্থাৎ তিনি এখানে পরিবেশ ও নারী অধস্তনের জন্য পিতৃতন্ত্র কর্তৃক তৈরি দ্বৈত মূল্যবোধকে দায়ী করেন।

দ্বৈতবাদী মনোভাব আধুনিক যুগে আরো ব্যাপকভাবে বিস্তার লাভ করেছে। আধুনিক চিন্তায় যুক্তি ও আবেগের মধ্যে বিস্তর পার্থক্য রয়েছে বলে ধরা হয়; যেমন, যুক্তিজ্ঞানের উৎস এবং সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করে বলে জ্ঞান উচ্চস্তরে আর আবেগ নিয়ত পরিবর্তনশীল ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় বলে নিম্নে অবস্থান করে। আধুনিক দার্শনিক কান্ট তাঁর নীতিদর্শনে যুক্তিকে উচ্চে তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, মানুষের মধ্যে যেমন বুদ্ধি রয়েছে, তেমনি অনেকগুলো প্রবৃত্তিও (যেমন ইচ্ছা, কামনা-বাসনা, আবেগ, হিংসা প্রভৃতি) রয়েছে। মানুষ যখন বুদ্ধি দ্বারা পরিচালিত হয় তখন কোনো সমস্যার উদ্রেক হয় না, কিন্তু যখন মানুষ কামনা-বাসনা বা আবেগ দ্বারা পরিচালিত হয় তখন সেখানে সমস্যার সৃষ্টি হয়। এভাবে কান্ট যুক্তি ও আবেগের মধ্যে পার্থক্য করেছেন। মন আর দেহের মধ্যে যে পার্থক্য যুক্তি ও আবেগের মধ্যে সে পার্থক্য। আবেগকে এভাবে জেন্ডার বৈষম্যের সাথে তুলনা করে আধুনিক কালের কিছু চিন্তাবিদ বলেন যে, পুরুষ যুক্তির অধিকারী এবং নারী আবেগময়ী, তাই পুরুষ নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করতে পারে। আধুনিকতা এভাবে যুক্তি ও আবেগের এক বৈষম্যমূলক ব্যাখ্যা আমাদের সামনে দাঁড় করিয়েছে এবং এই ব্যাখ্যা এও দাবি করে যে, যুক্তি নৈর্ব্যক্তিক ও সর্বজনীন জ্ঞানের মূল আধার বলে প্রকৃতির সবকিছুকে নিয়ন্ত্রণ করার

---

[২৮] ইসলাম, আমিনুল, ২০০৪, *পশ্চাত্য দর্শন : প্রাচীন ও মধ্যযুগ*, নওরোজ কিতাবিস্তান, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১২৪।
[২৯] বেগম, হাসনা, ১৯৯০, "প্লেটোর আদর্শ রাষ্ট্রে নারী", *নারী, নৈতিকতা ও সমাজ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ২৭।
[৩০] করিম, সরদার ফজলুল, ১৯৮৬, *দর্শনকোষ*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, পৃষ্ঠা ১৫৩।
[৩১] ওয়াহাব, শেখ আব্দুল, ১৯৮২, *কান্টের নীতিদর্শন*, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা, পৃষ্ঠা ৮৮।
[৩২] Plumwood, Val, *Op.cit.*, P. 43.
[৩৩] *Ibid*, P. 164.

যোগ্যতা রাখে।[৩৪] এ ব্যাখ্যা থেকে আমাদের কাছে একটি বিষয় স্পষ্ট যে পুরুষ যেহেতু যুক্তির অধিকারী, সেহেতু পুরুষ নারী ও প্রকৃতি উভয়ের ক্ষেত্রে আধিপত্য বিস্তার করতে পারে।

আধুনিক দার্শনিক ডেকার্ত মানুষের দেহ ও মনের দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তাঁর মতে, মানুষ হচ্ছে দেহ ও মনের সম্মিলিত সংগঠন। দেহ হচ্ছে মনহীন বস্তু আর মন হচ্ছে বস্তুহীন সত্তা। দেহ আর মন প্রকৃতিগতভাবে পরস্পরবিরোধী। মন হচ্ছে সচেতন সত্তা আর দেহ হচ্ছে অসচেতন সত্তা। মানুষ দ্বৈতসত্তার অধিকারী হলেও 'সচেতনতা' মানুষকে প্রকৃতি থেকে স্বতন্ত্র করেছে, উচ্চতর স্থানে আসীন করেছে। আধুনিক দার্শনিকদের এই দ্বৈতবাদী ব্যাখ্যা সামাজিক পর্যায়ে বৈষম্যকে (যেমন নারী-পুরুষ বৈষম্য, মানব-প্রকৃতি বৈষম্য, মালিক-উৎপাদনকারীর বৈষম্য) উৎসাহিত করেছে। মূলত এই বৈষম্যের মূলে রয়েছে পিতৃতান্ত্রিক চিন্তাধারা।

পিতৃতান্ত্রিক দ্বৈত মূল্যবোধ ও আধুনিকতা এভাবে সমাজে নারী-পুরুষের মধ্যে বিভাজন সৃষ্টি করে পুরুষকে শাসক হিসেবে ও নারীকে অধস্তনরূপে সমাজে প্রতিষ্ঠিত করে। নারীর অনুরূপ বৈষম্যমূলক মূল্যবোধ প্রকৃতির ক্ষেত্রেও কাজ করে। প্রকৃতি ও নারীর গুণাগুণকে নিম্নশ্রেণির মনে করে অসম্মান করা হয়। সভ্যতার সূচনালগ্ন থেকে নারী যে পুরুষের সাথে একত্রে কাজ করে সমাজকে প্রগতির দিকে এগিয়ে নিয়ে গেছে, সে নারীকে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যে পশ্চাৎপদ রাখার জন্য পুরুষতন্ত্র জেন্ডার বৈষম্য সৃষ্টি করেছে। এই জেন্ডার বৈষম্যের মূলে রয়েছে নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য। এই পার্থক্যকে পুঁজি করে সমাজে শ্রম বিভাজন করা হয়েছে, যে বিভাজনে নারীর কর্মস্থল গৃহাভ্যন্তর, যাকে আদতে কোনো কর্ম হিসেবে গণ্য করা হতো না এবং এখনো হয় না। এ কাজ অনুৎপাদনমূলক। একইভাবে প্রকৃতির উৎপাদনমূলক কার্যক্রমকে অবহেলা করা হয়। পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ অনুযায়ী, নারী ও প্রকৃতি হলো অধস্তন শ্রেণির। বিংশ শতাব্দীর সংস্কৃতিতে লক্ষ করা গেছে, পুরুষতন্ত্র নারী ও প্রকৃতিকে সহায়ক শক্তি হিসেবে মূল্যায়ন করে, সত্তা হিসেবে মূল্যায়ন করে না। সহায়ক শক্তি হিসেবে নারীকে মূল্যায়ন করা হয় বলেই নারীকে গৃহকর্মের সাথে যুক্ত করা হয়।[৩৫] নারীকে যখন গৃহকর্মের বাইরে সুযোগ দেয়া হলো তখন নারীর কর্মক্ষেত্রেও সুকৌশলে এমনভাবে নির্ধারণ করা হলো যাতে নারী কোনো উচ্চ পদে যেতে না পারে। ফলে বহির্জগতে নারী সেবিকা বা সেক্রেটারির ভূমিকায় কাজ করার সুযোগ পেল। প্লামউড নারীর এমন ভূমিকাকে সহায়ক ভূমিকা হিসেবে অভিহিত করেছেন।[৩৬]

প্লামউড মনে করেন, সমাজ নারীকে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে গণ্য করলে নারী সমাজে দ্বিতীয় শ্রেণির সত্তা অর্থাৎ সহায়ক ভূমিকা পালনকারী সত্তা হিসেবে গণ্য হতো না। এক্ষেত্রে আমরা নারীবাদী সিমোঁন দা বোভোয়ারের মতাদর্শ উল্লেখ করতে পারি। তিনি বলেছেন যে, সমাজে নারীর পরিচয় হলো অপর বা দ্বিতীয় লিঙ্গ (second sex) হিসেবে।[৩৭] তাঁর মতে, নারী সমাজে পুরুষের সমান ভূমিকা রাখা সত্ত্বেও মূল্যায়িত হচ্ছে 'other' বা 'অপর' হিসেবে। অপরপক্ষে যে প্রকৃতি মানুষের জীবনে অফুরন্ত সম্পদ দান করে সে প্রকৃতিকেও মানুষ সহায়ক মূল্য হিসেবে গণ্য করে। আসলে নারী ও প্রকৃতির প্রতি মানুষের মূল্যায়ন একইরকম। প্লামউডসহ অন্যান্য পরিবেশ নারীবাদীরা এ বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে তাঁদের মতাদর্শে

[৩৪] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৮৬।
[৩৫] *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৮৭।
[৩৬] Plumwood, Val, *Op. Cit.*, P. 21.
[৩৭] Tong, Rosemarie, Putnam, *Op.cit.,* P. 252.

তুলে ধরেছেন; যেমন, পরিবেশ-নারীবাদী বন্দনা শিবার মতে, পুরুষতন্ত্র নারীদের অধীনস্ত করে রাখার জন্য সমাজে দ্বৈত মূল্যবোধ তৈরি করে রেখেছে। এই দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে নারীর কর্ম ও জ্ঞান সমাজে অবমূল্যায়িত থেকে যায় এবং নারী পুরুষের অধীনস্ত হিসেবে বাস করে। দ্বৈত মূল্যবোধের কারণে নারীর মতো প্রকৃতির অফুরন্ত দানকেও মানুষ মূল্যায়ন করতে ব্যর্থ হয়। শিবার মতো রোজমেরি রিউদারও (Rosemary Ruether) মনে করেন, গ্রিকদের সময় থেকেই সমাজে দ্বৈতবাদের ধারণা চলে আসছে।[৩৮] এই দ্বৈততার ধারণা থেকে বলা হলো যুক্তি ও আবেগ, মন ও দেহ, মানব ও প্রকৃতি, পুরুষ ও নারী পরস্পর বিপরীত। এই বিপরীত প্রত্যয়সমূহ মানুষের মনে যেসব তাত্ত্বিক ধারণার জন্ম দিয়েছে তা থেকে মনে করা হলো নারী আবেগ, দেহ ও প্রকৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত; অপরদিকে পুরুষ যুক্তি, মন ও সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত। দ্বৈততার এই ধারণা থেকে নারীর স্থান পুরুষের নিচে।[৩৯] অপর পরিবেশ-নারীবাদী ক্যারোলিন মার্চেন্ট নারী ও প্রকৃতির ওপর আধিপত্যের উৎস হিসেবে শিল্পায়ন ও আধুনিক যান্ত্রিক দৃষ্টিভঙ্গি অর্থাৎ পিতৃতান্ত্রিক দ্বৈত মূল্যবোধকে দায়ী করেন।

পরিবেশ-নারীবাদীরা (যেমন ওয়ারেন ও প্লামউড) নারী ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের নিপীড়ন ও কর্তৃত্বের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। এ কারণেই তাঁরা নারীবাদ ও পরিবেশবাদের লক্ষ্যকে এক বলে গণ্য করেন। নারীবাদী বিভিন্ন তত্ত্বগুলোর মধ্যে লিবারেল, র‍্যাডিক্যাল, মার্কসীয় ও সমাজতান্ত্রিক নারীবাদ অন্যতম। লিবারেল নারীবাদ অনুযায়ী, সমাজ হচ্ছে পুরুষতান্ত্রিক। পুরুষতান্ত্রিক সমাজ নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে পুঁজি করে নারীর মধ্যে কতগুলো নেতিবাচক বৈশিষ্ট্য (যেমন নারী দুর্বল, হীন, ভীরু, আবেগপ্রবণ, সিদ্ধান্ত নিতে অপারগ) আরোপ করে নারীকে নিপীড়ন করছে। অপরদিকে পুরুষের মধ্যে কতগুলো ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য (যেমন পুরুষ যুক্তির অধিকারী, বীর, সাহসী, পরাক্রমশালী) আরোপ করে নিজেদের উচ্চে তুলে ধরেছে। পুরুষ কর্তৃক আরোপিত উক্ত বৈশিষ্ট্যের কারণে নারী-পুরুষের মধ্যে অসমতা বিরাজ করছে সমাজে। এই অসমতার বিরুদ্ধে নারীবাদীরা আন্দোলন করে। উদারতাবাদীদের মতে, সমাজে সমতা প্রতিষ্ঠা করতে হলে নারীকে নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে পুরুষের উপর্যুক্ত বৈশিষ্ট্য অর্জন করতে হবে। প্লামউড মনে করেন যে, নারীবাদীদের এমন চিন্তাধারা নিতান্তই অযৌক্তিক। নারী-পুরুষ সমতা প্রতিষ্ঠার বিষয়ে লিবারেল নারীবাদ যে মতাদর্শ প্রদান করেছে (নারী পুরুষের বৈশিষ্ট্য অর্জন করবে এবং নারীর বৈশিষ্ট্য বিসর্জন দিবে), তিনি তাকে বিচার বিশ্লেষণহীন চেতনা হিসেবে দেখেছেন। তিনি মনে করেন, তাদের বিচারহীন চেতনা নারীকে এমনভাবে প্ররোচিত করবে, যেখানে নারী পুরুষের মতো শোষণে নিয়োজিত হবে এবং প্রকৃতি জগতে নারী নিজেই আধিপত্য বিস্তারকারী প্রভুর ভূমিকা গ্রহণ করবে। লিবারেল নারীবাদকে প্লামউড নারীবাদের প্রথম প্রবাহ হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন।[৪০] লিবারেল নারীবাদকে সমালোচনা করে তিনি বলেন, যে যুক্তিতে পুরুষতান্ত্রিকতা নারীবাদীদের কাছে অগ্রহণীয় ওই একই যুক্তিতে লিবারেল নারীবাদ নারীবাদের কাছে অগ্রহণীয়।[৪১]

লিবারেল নারীবাদের বিপরীত মতবাদ হলো র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ। এই মতবাদ নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকার করে কিন্তু অন্যান্য পার্থক্য (যেমন নারী দুর্বল, হীন, ভীরু ইত্যাদি) অস্বীকার করে।

---

[৩৮] Warren, K. J., 2012, "Women Connections", (Online) http:/ media.pfeiffer:edu/ Iridener/ Courses/ Ecowarrn.html
[৩৯] Ibid.
[৪০] Plumwood, Val, *Op.Cit.*, P. 27.
[৪১] খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৯১.৯২।

র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীদের মতে, জীবতাত্ত্বিক কারণে নারী-পুরুষের বৈশিষ্ট্য ভিন্ন; যেমন, নারীর বৈশিষ্ট্য হলো সন্তানধারণ, লালনপালন, সহানুভূতি, পরিচর্যানীতি ইত্যাদি। নারীর এই ভিন্ন বৈশিষ্ট্যকে মর্যাদা দিতে হবে। অপরদিকে পুরুষের বৈশিষ্ট্য নিপীড়নমূলক, অতএব এরূপ বৈশিষ্ট্য পরিহার করতে হবে। প্লামউডের মতানুযায়ী, র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ পুরুষ বৈশিষ্ট্য বর্জন করে নারী বৈশিষ্ট্যকে উচ্চে তুলে ধরে অধস্তনকে উর্ধ্বতন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করে। এ কারণে প্লামউড এ মতবাদকে বাছ-বিচারহীন বৈপরীত্যের[৪২] (uncritical reversal) নারীবাদ বলে সমালোচনা করেন।

বাছ-বিচারহীন র‍্যাডিক্যাল নারীবাদকে তিনি নারীবাদের দ্বিতীয় ওয়েভ হিসেবে বর্ণনা করেন।[৪৩] দুটি মতবাদের ত্রুটিগুলো চিহ্নিত করাই ছিল তাঁর সমালোচনার লক্ষ্য। তবে প্লামউড র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের নারীর অভিজ্ঞতার দিকটি পরিবেশ-নারীবাদের ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের সমাজ পুরুষতান্ত্রিক মূল্যবোধ দিয়ে তৈরি। পুরুষতন্ত্র মনে করে, পুরুষ সবল ও বুদ্ধিবৃত্তির অধিকারী বলে তার মধ্যে সৃষ্টিশীল ক্ষমতা আছে, পুরুষ তাই সংস্কৃতির বাহক; কিন্তু নারী দুর্বল ও আবেগের অধিকারী বলে সংস্কৃতির বাহক হতে পারে না। নারী প্রকৃতির সাথে যুক্ত, প্রকৃতি হলো জড় ও নিষ্ক্রিয়। নারী ও প্রকৃতিকে পুরুষতন্ত্র একই মানদণ্ডে বিচার করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারী ও প্রকৃতিকে অভিন্নরূপে দেখে কিন্তু পুরুষকে প্রকৃতি-বহির্ভূত বলে দাবি করে; যেমন, পুরুষ নারীকে সংস্কৃতি-বহির্ভূত দাবি করে।[৪৪] প্লামউড মনে করেন, পরিবেশ-নারীবাদ মানুষকে উল্লিখিতভাবে অসম্পূর্ণ ভাগে ভাগ না করে বরং নারী ও পুরুষ উভয়কে প্রকৃতি ও সংস্কৃতির অংশ হিসেবে গণ্য করলে তা অধিক মাত্রায় যুক্তিযুক্ত হবে। এমন মতবাদকে তিনি সবিচার পরিবেশ-নারীবাদ বলেন।[৪৫]

প্লামউড মনে করেন, নীতিবিদ্যার প্রচলিত সর্বজনীন নীতি (যা সবার জন্য প্রযোজ্য) নারী ও প্রকৃতি সম্পর্কিত ধারণা (অধস্তন ধারণা) সৃষ্টির জন্য দায়ী। সনাতনী নীতিবিদ্যায় মূল্যায়নের ক্ষেত্রে কোনো কিছুর বিশেষ দিককে অগ্রাহ্য করে সার্বিক দিককে গণ্য করা হয়। নারী বৈশিষ্ট্য (মাতৃত্ব, অপরের প্রতি পরিচর্যার মনোভাব) অনন্য বলে সর্বজনীন নয়, আর সবর্জনীন নয় বলে সনাতনী নীতিবিদ্যায় স্থান পায় নি বরং অবহেলার বিষয়ে পরিগণিত হয়েছে।[৪৬] তাঁর মতানুযায়ী নারী প্রকৃতির সঙ্গে যুক্ত বলে নারীর প্রতি সমাজের যে মূল্যায়ন প্রকৃতির প্রতিও একই মনোভাব বিদ্যমান। প্লামউড নারীর ভিন্ন বৈশিষ্ট্য বা অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করার পক্ষে মতপ্রকাশ করেন।

পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে ক্যারেন ওয়ারেন ও ভাল প্লামউডের মতাদর্শের ক্ষেত্রে যেসব বিষয়ে সাদৃশ্য রয়েছে তা হলো—

প্রথমত, তাঁরা উভয়েই পুরুষতন্ত্র কর্তৃক নারী নিপীড়ন ও প্রকৃতির প্রতি পুরুষতন্ত্রের কর্তৃত্বের মধ্যে সাদৃশ্য লক্ষ করেছেন। নারী ও পুরুষের মধ্যে সেক্স বা জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য নিয়ে নারীবাদী, পরিবেশ-নারীবাদীদের কোনো দ্বিমত নেই। কিন্তু পুরুষতন্ত্র নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যের ওপর ভিত্তি করে সমাজে যে

---

৪২ Plumwood, Val, *Op.Cit.*, P. 35.

৪৩ *Ibid*, P. 27.

৪৪ খানম, রাশিদা আখতার, *পূর্বোক্ত*, পৃষ্ঠা ৯৪।

৪৫ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৯৪।

৪৬ *প্রাগুক্ত*, পৃষ্ঠা ৭৯।

জেন্ডার বৈষম্য (নারী দুর্বল ও হীন প্রকৃতির এবং পুরুষ সবল ও উচ্চ প্রকৃতির) সৃষ্টি করেছে, ওয়ারেন ও প্লামউড উভয়েই এই জেন্ডার বৈষম্যের বিরোধী। তাঁরা নারী-পুরুষের জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে স্বীকার করেন কিন্তু সমাজ নির্মিত জেন্ডার পার্থক্য স্বীকার করেন না।

দ্বিতীয়ত, উভয়েই সার্বিক নীতির পরিবর্তে বিশেষ নীতি অর্থাৎ নারীর বিশেষ অভিজ্ঞতাকে গুরুত্ব দিয়েছেন। কান্ট ও রলস উভয়েই সার্বিক নীতিতত্ত্বে বিশ্বাসী।[৪৭] কিন্তু ওয়ারেন ও প্লামউড মনে করেন, নারী অভিজ্ঞতা বিশেষ অভিজ্ঞতা, এ অভিজ্ঞতা পুরুষ কখনো উপলব্ধি করতে পারে না। কান্টীয় নীতিদর্শন (duty for duty sake) কেবল ব্যক্তি বা সমাজকেন্দ্রিক নয়, সার্বিকভাবে সমগ্র মানবজাতির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য। কান্টের মতো রলসও সার্বিক নীতির ওপর গুরুত্ব দিয়েছেন, ব্যক্তিক নীতিকে অগ্রাহ্য করেছেন। নারীবাদীরা মনে করেন, ব্যক্তিক নীতি হচ্ছে বিশেষ নীতি অর্থাৎ নারী অভিজ্ঞতা। ওয়ারেনের উত্তম-পুরুষ ন্যারেটিভ প্রকৃতপক্ষে ব্যক্তি অভিজ্ঞতাকে নির্দেশ করে। বিশেষ নীতি বলতে এখানে তিনি নারী প্রেক্ষিতকে বুঝিয়েছেন। ওয়ারেন সার্বিক নীতির বিপরীত নীতি অর্থাৎ ব্যক্তিক নীতিকে গ্রহণ করেন। কেননা সার্বিক নীতি ব্যক্তির মূল্যবোধকে অগ্রাহ্য করে। প্লামউডও ওয়ারেনের মতো নারী অভিজ্ঞতা বা নারীর মূল্যবোধ অর্থাৎ বিশেষ নীতি বা ব্যক্তিক নীতিকে গুরুত্ব দেন।

তৃতীয়ত, ওয়ারেন ও প্লামউড পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে যে মতবাদ দেন তা র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদীরা মনে করেন, নারীকে অধস্তন করার মূলে রয়েছে জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য। এই মতবাদের অনুসারীরা জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য স্বীকার করলেও অন্যান্য পার্থক্য (যেমন পুরুষ বৌদ্ধিক, পরাক্রমশালী এবং নারী আবেগপ্রবণ, নিম্নস্তরের, পরনির্ভরশীল অর্থাৎ দ্বৈত মূল্যবোধ) অস্বীকার করে। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ নারী অভিজ্ঞতা ও নারীর মূল্যবোধের ওপর গুরুত্ব আরোপ করে। ওয়ারেন তেমনি জীবতাত্ত্বিক পার্থক্যকে অস্বীকার করেন না এবং নারীর মূল্যবোধ যে পুরুষ থেকে ভিন্ন সে বিষয়ের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেন। এদিক থেকে ওয়ারেনের পরিবেশ-নারীবাদ র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ওয়ারেনের মতো প্লামউডের মতবাদও র‍্যাডিক্যাল নারীবাদের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ। র‍্যাডিক্যাল নারীবাদ অনুযায়ী, নারী অভিজ্ঞতা বর্ণনা করা নারীর দৃষ্টিতে হতে হবে অর্থাৎ নারীকে জানার জন্য নারীর প্রতি সদর্থক চেতনা থেকে হতে হবে। পরিবেশ-নারীবাদী দার্শনিক প্লামউড নারীবাদের এই অভিমত গ্রহণ করেন। তিনি মনে করেন, মূল্যায়নের ক্ষেত্রে নারীর অভিজ্ঞতাকে মূল্যায়ন করা উচিত। নারীর বিষয়টি বিশেষ বলে মূল্যায়নের ক্ষেত্রে উপেক্ষিত থেকে যায়। আর বিশেষ দিকটি উপেক্ষা করা হয় বলেই পুরুষতন্ত্র নারীর ওপর আধিপত্য বিস্তার করে। নারীর মতো প্রকৃতির বিষয়টিও বিশেষ। নারীর প্রতি সমাজের যে মনোভাব প্রকৃতির প্রতি ওই একই মনোভাব।

চতুর্থত, পরিবেশ-নারীবাদী দার্শনিক প্লামউড ও ওয়ারেন উভয়ে নারী ও প্রকৃতিকে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে গ্রহণ করেন, সহায়ক মূল্য হিসেবে গ্রহণ করতে চান না। মানবকেন্দ্রিক মতবাদ, মানব প্রজাতির শ্রেষ্ঠতায় বিশ্বাস করে বলে মানুষকে স্বতঃমূল্য সত্তা হিসেবে এবং প্রকৃতিকে সহায়ক সত্তা হিসেবে গ্রহণ করে।

[৪৭] Jardins, J.R.D., *Op.Cit.,* PP. 238-239.

উপসংহার ও সুপারিশ

পরিবেশ-নারীবাদ সম্পর্কে ওয়ারেন ও প্লামউড যে মতাদর্শ দিয়েছেন তা অনুসরণ করলে মানুষের মূল্যবোধের গুণগত পরিবর্তন সাধিত হতে পারে। মানুষের মূল্যবোধের পরিবর্তন মানেই সমাজের পরিবর্তন। সমাজের গুণগত পরিবর্তন মানুষকে নতুন করে ভাবতে শেখায়, আলোকিত করে, জ্ঞানের শিখরে উঠতে সহায়তা করে এবং নতুন আবিষ্কারের নেশায় মত্ত করে। কার্ল মার্কস শোষক শ্রেণির অনৈতিক মূল্যবোধকে আঘাত করে (শোষিত শ্রেণির পক্ষে) সমাজের যে গুণগত পরিবর্তন এনেছেন, তা বিশ্ববাসী আজো স্মরণ করছে। রাজা রামমোহন রায় সতীদাহ প্রথা বন্ধ করে সমাজে নারীদের যে মহা নিপীড়নের হাত থেকে রক্ষা করেছেন, তাকে হিন্দু সম্প্রদায়ের গুণগত পরিবর্তন বলতে হবে। অবশ্য এক্ষেত্রে আমাদের দৃষ্টিভঙ্গিকে উদার করতে হবে। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বিধবা বিবাহের প্রচলন করে নারীদের মানবিক জীবনযাপনে সহায়তা করেছেন। প্রাচ্যের নারীবাদী বেগম রোকেয়া শিক্ষার মাধ্যমে নারীদের অন্ধকার থেকে আলোর পথ দেখিয়েছেন। এসব ব্যক্তিত্ব উদারনৈতিক মনোভাব নিয়ে সবকিছুকে বিবেচনা করেছেন বলে মানুষের নৈতিক মূল্যবোধের পরিবর্তন করতে সক্ষম হয়েছিলেন।

নৈতিক মূল্যবোধ প্রতিটি মানুষের মধ্যে জাগ্রত করার লক্ষ্যে আমাদের কাজ করতে হবে। এ ধরনের নৈতিক মূল্যবোধ নারী-পুরুষকে সমানভাবে মর্যাদাপূর্ণ হিসেবে গণ্য করবে। নৈতিক মূল্যবোধ সমঅধিকার, ন্যায়পরায়ণতা, সহমর্মিতা ও মানবতাবোধের জন্ম দেয়। মূল্যবোধের সঠিক বিকাশ ঘটলে সমাজ থেকে দ্বৈতবাদী মনোভাব দূরীভূত হবে এবং প্রকৃতি ও মানুষের ক্ষেত্রে সম, সৌহার্দ্যপূর্ণ আচরণ প্রতিষ্ঠিত হবে, যা নারী কিংবা প্রকৃতির অবদমনকে প্রতিহত করতে সক্ষম হবে। মমত্বপূর্ণ ও উদারনৈতিক মূল্যবোধই মানবসমাজকে সামাজিক ও প্রাকৃতিক অবক্ষয় থেকে রক্ষা করে কল্যাণকর এবং আলোকিত সমাজ ও জীবন গড়তে সহায়তা করে। প্রয়োজনীয় পরিবর্তন নতুন যুগের সূচনা করবে। সমাজ সংস্কারকগণ সমাজের নেতিবাচক দিকগুলো মূল্যায়ন করেছেন বলেই কার্ল মার্কস শোষিত মানুষের জন্য কাজ করে গেছেন, রামমোহন রায় নারীর জন্য অবমাননাকর সতীদাহ প্রথা বন্ধ করতে পেরেছেন। ওয়ারেন ও প্লামউড নারীর অভিজ্ঞতাকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করেছেন এবং তার অনুশীলনের কথা বলেছেন। একইসাথে তিনি দ্বৈত মূল্যবোধ থেকে প্রকৃতির প্রতি সমাজের আগ্রাসী মনোভাবের যে বিষয়টি তুলে ধরেছেন তা যদি যথাযথভাবে পরিহার করা যায়, তাহলে হয়ত নারী তার মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত হবে এবং প্রকৃতি আপন বৈশিষ্ট নিয়ে ধরিত্রীর বুকে সমাসীন থাকতে পারবে।

ড. রাজিয়া খানম লাকি প্রভাষক, দর্শন বিভাগ ও ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান, তেজগাঁও কলেজ। raziakhanom(2014)@gmail.com